‘দাবায়ে রাখতে পারবা না’

জাফর ওয়াজেদ

‘স্বাধীনতা’ ও ‘মুক্তি’ শব্দ দুটোই তাঁর অতীব প্রিয়। এই দুটো শব্দকে কেন্দ্র করে তাঁর জীবনাবর্তন ঘটেছে। মুক্ত মানুষ আর তাঁর স্বাধীনতা অধিকার প্রতিষ্ঠায় নিজেকে উৎসর্গীকৃত করেছেন শুধু নয়, প্রতিষ্ঠার কাজটিও অনেক দূর বিস্তৃত করতে পেরেছেন স্বল্পায়ু সময়েও। স্বাধীনতা এসেছে, কিন্তু মুক্তির দিগন্ত এখনও দূর, বহুদূর। একাত্তরের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর প্রিয় বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য ডাক দিয়েছিলেন। সেই ডাকে পুরো জাতি সাড়া দিয়েছিল কতিপয় কুলাঙ্গার ছাড়া। কিন্তু এই ডাক তো আর আকস্মিকভাবে আসেনি। দীর্ঘ দিনের নির্যাতন, নিপীড়ন, শাসন, ত্রাসন, শোষণ, বঞ্চনার বিরুদ্ধে আন্দোলন, সংগ্রাম, কারাবরণ এবং জনগণকে স্বাধীনতার দাবির জন্য ধীরে ধীরে তৈরি করে নিয়েছিলেন। বাংলা ও বাঙালিকে ভালবেসে, তাদের স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য তিনি ধারাবাহিকভাবে এগিয়েছেন। শত বিপর্যয়কে রুখে তিনি ক্রমাগত নিজেকেও তৈরি করেছেন জনগণের জন্য। জনগণের মন ও ভাষাকে আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন বলেই তাদের একান্ত আপন হয়ে উঠেছিলেন ব্যক্তিগতভাবে থেকে ক্রমশ রাজনৈতিকভাবে। বাঙালি জাতির ইতিহাস তার জানা ছিল। চর্মচক্ষে বাঙালির বঞ্চনা, শোষণ, নিপীড়ন সবই দেখেছেন ব্রিটিশ ভারত ও পাকিস্তান পর্বে। পাকিস্তানি মন্ত্রীর উদ্দেশে ১৯৬৪ সালের ১২ জুলাই পল্টন ময়দানে এক জনসভায় বলেছিলেন, ‘মন্ত্রিসাহেব! বাংলার ইতিহাস আপনি জানেন না। এই বাংলা মীরজাফরের বাংলা। আবার এই বাংলাই তিতুমীরের বাংলা, এই বাংলা হাজী শরিয়তুল্লাহর বাংলা। এই বাংলা সুভাষ-নজরুল-ফজলুল হক-সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ইসলামাবাদীর বাংলা। এই বাংলা যদি একবার রুখে দাঁড়ায়; তবে আপনাদের সিপাই-বন্দুক কামান-গোলা সবই স্রোতের শ্যাওলার মতো কোথায় ভেসে যাবে হদিসও পাবেন না।’ পাকিস্তানি জান্তা শাসকদের জুলুমের প্রতিবাদে ‘জুলুম প্রতিরোধ দিবস’ পালন করেছিল আওয়ামী লীগ। সে জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান জলদ গম্ভীর কণ্ঠে বক্তৃতার শেষ ভাগে ঘোষণা করেন যে, ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের সর্বাত্মক সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম আমাদের বাঁচব কি মরবো’র সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম আমাদের অধিকার পাব কি পাবনা’র সংগ্রাম। এ সংগ্রামে অনেককে হয়ত ফাঁসি কাষ্ঠেও ঝুলতে হতে পারে।’ শেখ মুজিব জানতেন, বুঝতেনও যে, জনগণের প্রাণবহ্নির সামনে নমরুদ-ফেরাউন যখন টিকেনি, হিটলার-মুসোলিনী যখন টিকেনি, তখন লাখ কোটি নিরন্ন বুভুক্ষুর ক্রোধানলের সামনে এদেশের ক্ষমতাসীনরাও টিকবে না। চূড়ান্ত পর্যায়ে তারা আদৌ টিকতে পারেনি।

বাঙালির মুক্তির জন্য শেখ মুজিব ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর হতেই আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৬৩ সালের ২০ অক্টোবর এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন, ‘পরিস্থিতির নিদারুণ পরিণতিতে আজ আমরা বিশ্বাস করতে বাধ্য হচ্ছি যে, পূর্ব পাকিস্তান একটি উপনিবেশে পর্যবসিত হয়েছে এবং এই ঔপনিবেশিক শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে হলে আমাদের অবিরাম সংগ্রাম করে যেতে হবে। জনসাধারণের প্রতি ক্রমবর্ধমান অবজ্ঞা প্রদর্শন করে এবং দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং দাবি-দাওয়ার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে সরকার যে খেলায় মেতেছে, তা আগুন নিয়ে খেলারই নামান্তর এবং এই খেলার পরিণতি অবশ্যই আজকের রাষ্ট্র নায়কদের ভোগ করতে হবে।’ পাকিস্তান পর্বে পাকিস্তানি শাসক-শোষকদের বিরুদ্ধে তিনি ক্রমান্বয়ে আন্দোলন চালিয়ে এসেছেন। প্রতিটি স্তরেই তিনি সাহসের

বরাভয় কাঁধে নিয়ে এগিয়ে গেছেন। বাধা বিপত্তি পাড়ি দিতে কখনও কুণ্ঠাবোধ করেননি। এই সাহসী পদযাত্রায় তিনি বাঙালি জাতিকে তৈরি করতে থাকেন মুক্তির মন্ত্রে। স্বাধিকারের দাবিকে ক্রমান্বয়ে সামনে নিয়ে এসে বাঙালি জাতিসত্তার বিকাশ ঘটাতে সারাদেশে সভা-সমাবেশ করেছেন।

শেখ মুজিবুর রহমান জানতেন, জেল জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন উপেক্ষা করে দেশব্যাপী জনগণ যে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলেছে, তা রোধ করার সাধ্য কারও নেই। বিশ্বাস ছিল; দৃঢ় প্রতিজ্ঞ জনসাধারণ যে কোনো মূল্যে তাদের হৃত অধিকারসমূহ ফিরিয়ে আনবেই। তখন দেশের একপ্রান্ত হতে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত সকল মানুষের মুখে মুখে অধিকারের দাবিই প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। শেখ মুজিব উপলব্ধি করছিলেন গণচেতনার দুর্বার স্রোতের মুখে সকল বাধাই বালির বাঁধের মতো নস্যাৎ হয়ে যাবে এবং কোনো মহাশক্তিই জনগণের এই দুর্বার সংগ্রামকে রোধ করতে পারবে না।

পাকিস্তানের দু'অংশের মধ্যে যে অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রকট হয়ে উঠেছিল, তা বাঙালি রাজনীতিকদের মধ্যে কোনো আলোড়ন তোলেনি, কেবল শেখ মুজিব ও তার আওয়ামী লীগ ছাড়া। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সতেরো বছরের মাথায় তিনি এই সময়ের হিসাব-নিকাশের জন্য আন্তর্জাতিক কমিশন দাবি করেন। পূর্ব পাকিস্তানের যে পরিমাণ অর্থ পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হয়েছে, তা আন্তর্জাতিক মর্যাদাসম্পন্ন অর্থনীতিবিদদের দিয়ে সঠিকভাবে নিরূপণ করে পূর্ব পাকিস্তানকে ফেরত দেয়ার দাবি তোলেন। তিনি এমনও বলেন যে, 'সত্য ও ন্যায়ের খাতিরে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণকে তাদের ন্যায্য পাওনা এবং নিজেদের সম্পদ হতে বঞ্চিত করা উচিত নয়।' এই যে বাঙালির ন্যায্য হিস্যা হাত ছাড়া হয়ে গেছে, আর বাঙালি দরিদ্রতর হচ্ছে ক্রমশ, শেখ মুজিবই তা বাঙালিদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। ১৯৬৪ সালের নয় জুন কক্সবাজারের জনসভায় তিনি কৃষকের দাবিকে সামনে এনে বলেছেনও, 'যে সকল কৃষকের অন্তত ২৫ বিঘা জমি নেই, আগামী ২৫ বছরের জন্য তাদের খাজনা মওকুফ করা উচিত।' দেশে যখন শিল্পপতিদের প্রাথমিক অবস্থায় করমুক্তির বিধান রয়েছে এবং মাসিক ছয় শ টাকার কম উপার্জনশীল ব্যক্তিদের আয়কর প্রদান করতে হয় না, তখন দরিদ্র কৃষকদের খাজনা মওকুফ না করার কোনো কারণ থাকতে পারে না।' বাংলার কৃষকদের দুরাবস্থা তিনি জানতেন, বুঝতেন। এর প্রতিকারে তিনি পুরো জীবন লড়াই করেছেন। স্বাধীন দেশেও তিনি কৃষক-শ্রমিকের অধিকার ও মুক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে কর্মসূচি নিয়েছিলেন। জীবনের শেষদিকে এসে তাই গঠন করেছিলেন বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ। মানুষের অভাব-অনটন, অনাহারের যে চিত্র তিনি দেখেছেন দেশভাগের পর থেকেই, তারই পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সময় দাবি তুলেছেন। বলেছেন, 'সোনার বাংলা আজ শ্মশানে পরিণত।' এর থেকে মুক্তি ও পরিত্রাণের উপায় তিনি খুঁজে বেরও করেছেন। এই বাংলার পথ-প্রান্তর, মাঠ-ঘাট ও নদীগুলো মুখরিত হয়ে থাকত কবি, জারি, সারি, ভাটিয়ালী, ভাওইয়ার সুরে। সে সুরের রেশটুকুও যে মুছে যাচ্ছে পাকিস্তানি শাসকদের কারণে, সে কথা জনগণকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন। ১৯৬৪ সালের সমাবেশে বলেছেন, 'পল্লী বাংলা আজ ভুখা-নাঙা। আর তারই যোগানো অর্থে আজ পিন্ডিতে নয়া রাজধানী গড়ে উঠছে। আওয়ামী লীগ গণআন্দোলনে বিশ্বাসী। জেল-জুলুমের তারা তোয়াক্কা করে না। জনসাধারণের দাবি আদায়ের সংগ্রামে পেছন থেকে ছুরিকাঘাত করবে, তা হবে না।' শেখ মুজিব এক্ষেত্রে জনগণকে সম্পৃক্ত করে আন্দোলনের গতিকে সামনে এগিয়ে নিয়েছেন। কিভাবে সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন, তার নমুনা মেলে ১৯৬৪ সালে নারায়ণগঞ্জের জনসভার ভাষণে। 'গ্রামে গ্রামে ইউনিয়নে ইউনিয়নে গণতন্ত্রের দুর্ভেদ্য দুর্গ গড়ে তুলুন। বেশি নয়, ইউনিয়নে মাত্র দশজন করে নিঃস্বার্থ কর্মী চাই। ইনশাআল্লাহ কর্মী বাহিনীর সমবেত কর্মোদ্যমকে সফল করে একদিন আমরা যেমন প্রবল প্রতাপান্বিত মুসলিম লীগ সরকারের সমাধি রচনা করেছিলাম, তেমনি করে এবারও আমরা শিকড়হীন আইয়ুব সরকারের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেব।' এভাবেই তিনি দশজন থেকে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে নিজেকে সম্প্রসারিত করেছেন তাদের ভাগ্যবদলের যাত্রাপথে। মানুষের মধ্যে লড়াকু মনোভাব তৈরি করতে বেগ পেতে হয়েছে এমনটা নয়।

শেখ মুজিব তার আসন্ন সংগ্রামে সকলকেই সঙ্গে নিতে রাজি বলে মন্তব্য করে ১৯৬৪ সালে বলেছিলেন, 'তবে কারাগারে যেতে যারা প্রস্তুত নন, গরম পানিতেও হাত দিতে যারা রাজি নন, চোগা-চাপকান ছেড়ে মাঠে নামতে যারা ইতস্তত করেন, তাদের অন্তত বর্তমান পর্যায়ে সঙ্গে নিতে আমরা রাজি নই। বিপদসংকুল এই সংগ্রামের দিনে তারা বিশ্রাম করবেন। জেল, জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতনের ঝক্কি পোহায়ে যদি আমরা সংগ্রামে জয়যুক্ত হতে পারি, তখন আপনারা এসে শরিক হবেন। হাসিমুখে আমরা আপনাদের বরণ করব। কিন্তু বর্তমান পর্যায়ে শঙ্কিতমনা কেউ এসে শরিক হলে সংগ্রাম আমাদের ব্যাহত হতে পারে। তাই অনুরোধ শঙ্কিতমনারা আপনারা আপাতত বিশ্রাম নেন।' তখনকার বাঙালি রাজনীতিবিদদের অবস্থা ও অবস্থান যে কোন্ পর্যায়ে, জনবিচ্ছিন্নতার কোন স্তরে যে বসবাস তা এই ভাষ্য থেকেই স্পষ্ট হয়। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর তল্পিবাহক হিসেবে এরা বাঙালির বিরোধিতা করতে কার্পণ্য করেনি। বাঙালির অধিকার ও দাবি-দাওয়া আদায়ে তারা এক পা-ও এগিয়ে আসেনি। বরং বঙ্গবন্ধুর বাঙালিপ্রীতি ও স্বদেশ ভাবনার বিপরীতে তারা পাকিস্তানি শাসক-শোষকগোষ্ঠীর মোসাহেবে পরিণত হয়েছিলেন। একাত্তর সালে তাদের অনেকেই বাঙালিবিরোধী পাকিস্তানি হায়েনাদের বশংবদ হিসেবে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরেছিল। বাঙালি জাতি যাদের ঘৃণা করে আজও। বঙ্গবন্ধু এদের চরিত্র সঠিকভাবেই জানতেন, বুঝতেন। রাজনৈতিক কৌশলগত কারণে এদের সঙ্গে নিয়ে সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেও বেশিদূর পর্যন্ত তাদের সঙ্গ নেননি। এসবের কার্যকারণও তিনি তুলে ধরেছেন। বিভিন্ন সময়ে তার ভাষণে বলেছেন, 'সংগ্রামে সবাইকে সঙ্গে নিতে আমরা রাজি। তবে পলাশীর আম্রকাননের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমি বলব, জয় যখন সুনিশ্চিত তখন রাতে বিশ্রাম নিয়ে ভোরের বেলায় পূর্ণ বিক্রমে ক্লাইভের সৈন্যের ওপর আবার আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ব– এমনি করে নবাব সিরাজুদ্দৌলার বিভ্রান্ত করার কলঙ্কের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির পথ প্রশস্ত করতে পারেন– এমন কাউকেই সঙ্গে নিতে আমরা রাজি না।'

বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে শেখ মুজিব সবসময় ছিলেন সোচ্চার। রাজনীতিতে যারা পাকিস্তানিদের পদলেহী, মোসাহেব, চাটুকার, তোষামুদে, তল্পিবাহক তাদের প্রতি ছিল তার অপরিসীম ক্ষোভ ও ঘৃণা। বাঙালি বংশোদ্ভূত এইসব রাজনীতিকরা সবসময়ই ছিল বাঙালির অধিকারবিরোধী। এরাও চাইতো বাঙালিকে পদানত করে রাখতে। আর বঙ্গবন্ধু চাইতেন বাঙালির মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার পথ তৈরি করতে এবং স্বাধীন ও মুক্ত মানব হিসেবে নিজস্ব অবস্থান নির্মাণ করতে। ১৯৬৪ সালের পাঁচ জুলাই নারায়ণগঞ্জে এক কর্মী সম্মেলনে অবস্থানের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন এই বলে যে, সমগ্র বাংলা যদি বিশ্বাসঘাতকতা না করে তবে দশ কোটি মানুষের (পাকিস্তানবাসি) বাঁচা-মরার এ যুদ্ধে জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী। ক্ষমতায় যাওয়ার যুদ্ধ নয়। এ যুদ্ধ ত্যাগের যুদ্ধ। এ যুদ্ধ আমাদের স্বায়ত্তশাসনের যুদ্ধ। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার যুদ্ধ। বঞ্চনার অবসান ঘটানোর যুদ্ধ। এ যুদ্ধ স্বাধীন দেশের স্বাধীন মানুষ হিসেবে আবার আমরা বিশ্ব সমাজে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারব কি না তারই যুদ্ধ।' যুদ্ধ তিনিই শুরু করেছিলেন বাঙালি জাতির মুক্তি ও স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করতে। তাই ডাক দিয়েছিলেন তিনি তারই গড়ে তোলা বাঙালি জাতিকে। যে জাতি সহস্র বছর ধরে নিপীড়িত, নিষ্পেষিত, শোষিত, তারই ডাকে বীরের মতো লড়াই করেছে বাঙালি। ৭ই মার্চের ভাষণে তিনি হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন। পাকিস্তানি জান্তা শাসকসহ শোষকদের উদ্দেশে বলেছিলেন, 'সাড়ে সাত কোটি মানুষকে আর দাবায়ে রাখতে পারবা না।' এই এক বাক্য সারা বাঙালি জাতির মাথা উঁচু করে দিয়েছে। সত্যিই অসাধ্য সাধন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। ইতিহাসের চাকাকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন। হাজার বছর ধরে পরাধীন পর্যুদস্ত থেকে যে জাতিটি আধমরা থেকে পুরো মরায় পরিণত হচ্ছিল ক্রমশ। বজ্র হুঙ্কারে শুধু নয়, আদর সোহাগে প্রাণের প্রবাহে স্পন্দন তুলে একটি বিন্দুতে এনে দাঁড় করিয়েছিলেন। সেই জাতি আজ বিশ্ব দরবারে নিজেদের মর্যাদাশীল জাতিতে উন্নীত করে তুলতে পেরেছে। তাই এ জাতিকে দাবিয়ে রাখা কারো পক্ষে সম্ভব হবে না।

লেখক: মহাপরিচালক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ ও একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক